সরিষাতলী প্রজেক্ট এ্যাফেক্টেড পিপিল্‌স্ এ্যাসেসিয়েশন

(S. P. A. P. A)

গ্রাম ঃ রাখাকুড়া, পোঃ চুরুলিয়া, থানা ঃ জামুড়িয়া, জেলা - বর্ধমান

বার্ষিক সম্মেলন ঃ ১১ই মার্চ, ২০০৫, শুক্রবার।

স্থান ঃ রাখাকুড়া

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

১৯৯৩ সালে 'কয়লা জাতীয়করন আইন' পুনর্বার সংশোধন করে বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানীগুলিকে নিজস্ব কয়লাখনি (Captive Mines) চালাবার অনুমতি দেওয়া হয়। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গে যে দুটি বেসরকারী কয়লাখনি স্থাপিত হয়েছে - তার মধ্যে ২০০২ সাল থেকে ছয় বর্গ কিলোমিটার জুড়ে গড়ে ওঠা গোয়েঙ্কার সি. ই. এস. সি. (Calcutta Electric Supply Corporation) পরিচালিত Integrated Coal Mining Limited (I.C.M.L.) -এর 'সরিষাতলী খেলামুখ কয়লাখনি প্রকল্প' অন্যতম। কারন এই কয়লাখনি বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রের জন্য ভারতবর্ষে প্রথম সম্পূর্ণ বেসরকারী কয়লাখনি প্রকল্প। প্রথমে এই প্রকল্প বিশ্বব্যাংক গ্রুপ (World Bank, Care Internations ও D.F.I.D.)-এর সাথে যৌথ মালিকানায় শুরু হবার কথা ছিলো। সেইমতো কাজ অনেকদূর এগোবার পরে বিশেষ কারণে পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। তারপরে প্রায় বছর দুয়েক নিশ্চুপ থেকে হঠাৎ-ই ২০০২ সালের মে মাস থেকে গোয়েঙ্কা কোম্পানী এককভাবে কয়লাখনি শুরু করে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রীসভা এই প্রকল্পের জন্য ২৬১৫ একর (১০৫৮.৭০ হেক্টর) জমি অধিগ্রহনের অনুমতি দিয়েছে। সেই অনুযায়ী ১৯৯৭ -এর ৯ই সেপ্টেম্বর 'জমি অধিগ্রহন আইন, ১৮৯৪' (Act I of 1894)-এর ৪ নং ধারা মোতাবেক ১২২০.৮৮ একর (৪৯৮.২৮ হেক্টর) জমি অধিগ্রহনের নোটিশ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। মন্ত্রীসভার অনুমোদিত ২৬১৫ একর জমির মধ্যে ১৭১৫.৭৯ একর (৬৯৪.৬৫ হেক্টর) রায়তি জমি এবং ৩৮২.৮৫ একর (১৫৫ হেক্টর) রসুনপুর সংরক্ষিত জঙ্গলের জমি আছে। এছাড়াও রেলওয়ের পরিত্যক্ত জমি ও অল্পকিছু সরকারী খাস জমি আছে। ইতিমধ্যে ১০০০ একরেরও বেশি রায়তি জমি বর্ধমান জেলা কলেক্টার মারফত অধিগৃহীত হয়েছে। তাই এক হাজার মানুষ জমি হারিয়েছেন। জমির উপর নির্ভরশীল বর্গাদার ও ক্ষেতমজুরের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। আনুমানিক ১৪টা গ্রামকে সরাসরি 'প্রকল্প দুর্গত গ্রাম' হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। আরও ছয়টা গ্রাম বা এলাকাকে 'প্রকল্প প্রভাবিত' হিসাবে মনে করা যেতে পারে। জনসংখ্যা প্রায় ৩০০০০, তার মধ্যে ৩৫ শতাংশরও বেশি তপশিলী জাতি ও আদিবাসী মানুষ। প্রকল্প শুরুর আগে এই অঞ্চলের মানুষের জীবিকা ছিল বৃষ্টি নির্ভর। একফসলি কৃষি; ক্ষেতমজুরী ও দিনমজুরী। পরিবার পিছু জমির মালিকানা এক হেক্টরেরও কম। জনসংখ্যার অর্দ্ধেকই ভূমিহীন মানুষ।

৫০ শতাংশরেও বেশি মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে (BPL) বাস করেন। এক নজরে ২০০১ সালের জনগননা থেকে কয়েকটি তথ্য দেখে নেওয়া যাক। আমাদের বর্ধমান জেলার কয়লা অঞ্চলে ৭টি ব্লক (পান্ডবেশ্বর, অন্ডাল, ফরিদপুর, রাণীগঞ্জ, জামুড়িয়া, বারাবনী ও সালানপুর) ও চারটি পৌরসভা (আসানসোল, রাণীগঞ্জ, কুলটি ও জামুড়িয়া) আছে। এই কয়লা অঞ্চলের অবস্থা সমগ্র বর্ধমান জেলা ও পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে কেমন, তা নিম্নরূপ ঃ-

	নারীর অনুপাত	১৮০ দিনের বেশী কাজ করে	১৮০ দিনের কম কাজ করে	কাজ করে না মহিলা ও শিশু সহ	তপশিলি জাতি আদিবাসী	জনসংখ্যার অনুপাতে কাজ করে(WPR)
বর্ধমানের কয়লা অঞ্চল	৮৭৬	২২.৯৮ %	৬.৩৭ %	৭০.৬৪ %	৩২.০৩ % (৩৫.৯৮) % শুধু ব্লক গুলিতে	২৯.৩৫ %
সমগ্র বর্ধমান জেলা	৯২২	২৭.৬ %	৮.০০ %	৬৪.৫ %	৩৩.৪ %	৩৫.৫ %
পশ্চিমবঙ্গ	৯৩৪	২৮.৭ %	৮.১ %	৬৩.২ %	২৮.৫ %	৩৬.৮ %

এই কয়লাখনি প্রকল্পের বেশিরভাগটাই বারাবনী ব্লকে। জামুড়িয়া ব্লকের চুরুলিয়া পঞ্চায়েতের একাংশ এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত। সমগ্র বর্ধমান জেলার মধ্যে সবথেকে পিছিয়ে থাকা পঞ্চায়েত ব্লক - বারাবনী ব্লক, বারাবনী ব্লকে তপশিলী জাতি ও আদিবাসী ৪৩.৩ শতাংশ এবং বারাবনী শহরে জনসংখ্যার অনুপাতে মানুষ কাজ করে (Work Participating Ratio) ২৪.৬ শতাংশ। এই এলাকার পরিকাঠামো অত্যন্ত্য প্রান্তিক চরিত্রের। রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, পরিশুদ্ধ পাণীয় জল, শিক্ষা ও স্বাস্থ পরিষেবার মান অত্যন্ত্য খারাপ। উপরোক্ত তথ্য প্রকল্প শুরুর আগে। কয়লাখনির জন্য আরও ২০০০ একর জমি চলে যাওয়ার পরে অবস্থা সহজেই অনুমেয়। সর্বশেষ জনগননা অনুযায়ী ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীন বেকারের সংখ্যা সর্বাধিক , তাই এই কয়লা অঞ্চল আজ কর্মহীনতার জন্য গ্রামীণ বেকারের বিস্ফোরনের মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

এই রকম একটি এলাকায় শুরু হয়েছে 'ইন্ট্রিগ্রেটেড কোল মাইনিং লিমিটেড' পরিচালিত 'সরিষাতলী কয়লাখনি প্রকল্প'। গত তিন বছরেই খনি এলাকার মানুষের নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ১৯৯৭ সালে জমি অধিগ্রহনের প্রথম নোটিশ প্রকাশিত হবার পর থেকেই এলাকার মানুষ অধিগ্রহনের বিরুদ্ধে, চাকরীর দাবীতে, রসুনপুর জঙ্গলের জমি নষ্ট না করার দাবীতে ইত্যাদি প্রশ্নে নানাভাবে আন্দোলন করে চলেছেন। সেই আন্দোলন প্রথম বাধাপ্রাপ্ত হয় যখন, প্রশাসক ও I.C.M.L.-এর সম্মতিতে PAP (Project Affected Peoples) কমিটি স্থানীয় রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহনে গঠিত হয়।

I.C.M.L. ও প্রশাসক এই PAP কমিটিকেই সাধারন মানুষের ক্ষোভের বিরুদ্ধে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেন। স্থানীয় সুবিধাবাদী, ধান্দাবাজ রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের আখের গোছাবার জন্য এই কাজে হাত লাগান। তারফলে প্রকল্প শুরুর আগে সঠিক দাবী নিয়ে প্রকল্প দুর্গত মানুষদের আন্দোলন যেভাবে গড়ে ওঠা উচিত ছিলো, তা হয়নি। তবু মানুষ নানাভাবে প্রতিরোধ চালিয়ে গেছেন। দুই একরের বেশি জমিহারা মানুষ, যারা কোম্পানীতে চাকরী পেলেন- তারাও স্থায়ীকরনের দাবী, জাতীয় কয়লা মজুরী চুক্তি, ইত্যাদি চালু করার দাবীতে আন্দোলন শুরু করেন। এমনকি স্থানীয় বিক্ষুব্ধ মানুষের সহযোগিতায় খনি ধর্মঘটে নেমে পড়েন। প্রশাসনের চাপে ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেও জমিহারা শ্রমিক ও স্থানীয় মানুষ প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল ছাড়াই নিজেদের শক্তি এবং ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। যার পরিনতি - গত ৮ই জুলাই, ২০০৩ আই. সি. এম. এল শ্রমিক ইউনিয়ন - এর জন্ম এবং ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০০৩ জনসভা করে তার প্রকাশ্য ঘোষনা।

আই. সি. এম. এল - এর কয়লাখনি অঞ্চলের মধ্যেই অবস্থিত এবং খনি পরিকল্পনার (Mine Plan) অন্তর্গত জামুড়িয়া থানার চুরুলিয়া পঞ্চায়েতের 'দিগুলী' ও 'রাখাকুড়া' গ্রাম দুটি। তাই কয়লা উত্তোলনের স্বার্থেই গ্রাম দুটির স্থানান্তর করণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এই অপরিহার্য স্থানান্তর করণ বিষয়ে পকল্প শুরুর অনেক আগেই (১৯৯৬ সাল থেকে) জেলা প্রশাসন ও I.C.M.L.-এর প্রতিনিধিদের সাথে রাখাকুড়া গ্রামের প্রতিনিধিদের বহুবার আলোচনা হয়েছে। জেলা প্রশাসন ও I.C.M.L. পুর্ণবাসন সম্পর্কে প্রায় ৭ বছর আগে ১৫ দফা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে রাখাকুড়া গ্রামের প্রতিনিধিদের মতামত এই ছিল যে, প্রশাসনকে উক্ত প্রতিশ্রুতি সমূহের চুক্তিতে অংশগ্রহন করতে হবে। যেহেতু জমি অধিগ্রহন করেছেন রাজ্য প্রশাসন, তাই শুধুমাত্র আই. সি. এম. এল নয়, পুর্ণবাসনের দায়িত্ব জেলা প্রশাসনকে নিতে হবে। জেলা প্রশাসক রাজী না হওয়ায় পুর্ণবাসন সংক্রান্ত আলোচনা স্থগিত থাকে। এরপর রাখাকুড়া মৌজার চাষযোগ্য রায়তি জমি অধিগ্রহনের প্রশ্ন আসে। রাখাকুড়ার গ্রামবাসীদের আপত্তি স্বত্তেও স্থানীয় এম. পি. শ্রী বিকাশ চৌধুরী, বিধায়ক (জামুড়িয়া) শ্রী পেলব কবি ও PAP কমিটির নেতাদের অনুরোধে তারা জমি দিতে রাজী হয়। পুর্ণবাসনের পরিকল্পনা সম্পর্কে নিশ্চুপ থেকে ২০০২ সাল থেকে ঐ জমির উপরেই এই প্রকল্প শুরু হয়েছে। ইতি মধ্যেই মাটি ও পাথরের বিশাল পাহাড় হয়ে গিয়েছে। রাখাকুড়া গ্রাম থেকে বাইরে বেরোবার রাস্তা আর নেই। গ্রামের চারপাশের ধুলোই প্রাণ অতিষ্ঠ। সব মিলিয়ে এই গ্রামের নাগরিক জীবন আজ বিপর্যস্ত। চুরুলিয়া থেকে কাপিষ্টা মোড় পর্যন্ত রাস্তায় স্বাভাবিক যান চলাচল তো দুরের কথা, মানুষের হাঁটারও অগম্য। বর্ষাকালে ঐ রাস্তার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। গত ৭ই অক্টোবর ২০০৩ বর্ধমান জেলা কালেক্টর অফিস থেকে পুর্ণবার রাখাকুড়া গ্রামে অংশ জমি অধিগ্রহনের নোটিশ (1. L.A. Case No. 8 (IV) 2002-2003/7231; 2. L.A. Case No. 9 (IV) 2002-2003/7232; 3. L.A. Case No. 10 (IV) 2002-2003/7233) পাঠানো হয়। রাখাকুড়া গ্রামবাসীরা বিধিবদ্ধ নিয়ম মেনে গত ৩০শে অক্টোবর, ২০০৩ চুরুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং (রাখাকুড়া) গ্রাম সংসদ -এর তলবি সভা ডেকে সংবিধানের একাদশ তপশিলে অনুচ্ছেদ ২৪৩ জি-এ উল্লেখিত ক্ষমতাবলে উক্ত অংশ জমির অধিগ্রহন, জনস্বার্থ বিরোধী বলে নোটিশ বাতিল করতে জেলা কালেকটরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সাধারন দরিদ্র-ক্ষমতাহীন মানুষেরা সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনী অনুসারে স্ব-শাসিত স্থানীয় সরকার - 'গ্রাম সংসদ'-এর সদস্য হিসাবে এভাবে নোটিশ বাতিল করতে পারেন। এটা জেনে আশেপাশের মানুষেরাও আলোড়িত হন। গত ২১শে নভেম্বর, ২০০৩ প্রকল্প দুর্গত আরেকটি গ্রাম রসুনপুরের গ্রামবাসীরাও জামগ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ নম্বর (রসুনপুর, ভেলাডাঙ্গা, শ্যামাপুর, আমুলিয়া) গ্রাম সংসদের তলবি সভা ডেকে জেলা প্রশাসন ও আই. সি. এম. এল. কর্তৃপক্ষ-এর কাছে বিভিন্ন দাবী উপস্থিত করেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধান কর্তৃক ষান্মাষিক গ্রাম সংসদ ডাকা শুরু হয় এবং সেই সভাগুলিতে মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ও প্রকল্প দুর্গত মানুষেরা বিভিন্ন দাবী উপস্থিত করে। ধীরে ধীরে মানুষ স্থানীয় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে গঠিত PEP কমিটির আওতার বাইরে আসতে শুরু করেন। তখন গুটিকয়েক শুভানুধ্যায়ী ছাড়া আমাদের পাশে দাঁড়াবার কেউ ছিলো না। প্রকল্প দুর্গত মানুষদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার এরকম উদাহরন পশ্চিমবঙ্গে বোধহয় আর নেই। সংবাদ মাধ্যম আমাদের সংবাদ পরিবেশন করেননা। হয়তো আমরা ততোটা বিক্রয়যোগ্য নই-যতটা হাসপাতালে শিশু মৃত্যু, নাবালিকা ধর্ষন, ধনঞ্জয়ের ফাঁসি বা আসানসোলের রাস্তার বেহাল অবস্থা ইত্যাদি। আসানসোলের পরিবেশবিদ্ মুর্শিদাবদে গঙ্গার ভাঙ্গন নিয়ে দৈনিক পত্রিকায় কলম ধরেন। কিন্তু তার এলাকার পাশেই প্রকল্প দুর্গত মানুষদের কথা শোনবার কেউ নেই। পশ্চিমবাংলার রাজনীতি মুলত মধ্যবাংলাকে ঘিরে আবর্তিত হয়। আমরা প্রান্তিক এলাকার প্রান্তিক মানুষ। এখানকার জনগোষ্ঠির সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তপশিলি জাতির, আদিবাসী, মুসলমান ও অন্যান্য পশ্চাদপদ পরিচয়ের। এই পরিচয়ের প্রযোজনীয় প্রতিনিধিত্ব কোলকাতার সরকারী দপ্তরগুলিতে এবং সংবাদ মাধ্যমে নেই। সুতরাং আমাদের কথা শুনবারও কেউ নেই। তাই গত ৩০শে নভেম্বর, ২০০৩ কাপিষ্টা গ্রামের প্রাথমিক স্কুলে এক গন কনভেনশনের মধ্য দিয়ে গঠিত হয়েছিল 'সরিষাতলী প্রজেকট্ এ্যাফেক্টেড পিপিলস্ এ্যাসেসিয়েশন' (S. P. A. P. A.)। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এস. পা. পা. ধারাবহিক ভাবে আন্দোলন করে চলেছেন। আশে পাশের সমস্ত গ্রাম ও শহরে আমাদের সংগঠন দেওয়াল লিখন, গ্রাম সভা বা সাইকেল মিছিল করে লাগাতার প্রচার চালায়। একই সাথে 'আই. সি. এম. এল. শ্রমিক ইউনিয়ন'-এর আন্দোলনও তীব্র হতে থাকে। গত ২৫শে আগষ্ট, ২০০৪-এ এস. পা. পা.-র নেতৃত্বে বারাবনী ব্লকের বিডিও অফিসে গনবিক্ষো ভ সহ দাবীপত্র পেশ করা হয়। তার পরে গত ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০০৪-এ আই. সি. এম. এল. দপ্তরে গন বিক্ষেভ সহ দাবীপত্র পেশ করা হয়। ইতিমধ্যে জমি অধিগ্রহন নোটিশের বিরুদ্ধে রাখাকুড়া গ্রাম সংসদের আপত্তির প্রেক্ষিতে গত ১৭ই ডিসেম্বর, ২০০৩ বর্ধমান জেলা কালেক্টর দপ্তরের আধিকারীক, চুরুলিয়া পঞ্চায়েত অফিসে শুনানীর জন্য আসেন। উক্ত শুনানীতে রাখাকুড়া গ্রামবাসীদের সমস্ত দাবীর নায্যতা স্বীকার করে ভারপ্রাপ্ত আধিকারীক প্রস্তাব গ্রহন করেন। বলে যান, জেলা শাসক মহাশয় রাখাকুড়া গ্রাম কমিটির সাথে আলোচনা করে বিষয়টির নিস্পত্তি করবেন।

জেলা শাসক মহাশয় কোন সভা না ডাকলেও রাখাকুড়া গ্রামবাসীরা জেলা শাসক মহাশয়ের সাথে নিজে থেকে দেখা করে সমস্ত বিষয় অবহিত করেন। ওনার কথামতো অতিরিক্ত জেলাশাসক, আসানসোল-এর সাথেও প্রতিনিধি দল কথা বলে। যদিও বিষয়টি নিস্পত্তি হয়নি। যে দাবীগুলি নিয়ে এস. পা. পা. ধারাবাহিক প্রচার চালাচ্ছে তা নিম্নরূপ ঃ-

১) আসানসোল - রাণীগঞ্জ এলাকায় কয়লাখনির কাজ শুরু হয়েছে আজ থেকে আড়াই'শ বছর আগে থেকে । এই কয়লাখনির সাথে গড়ে উঠতে শুরু করে কয়লা নির্ভর শিল্প ও শিল্প শহর। আশে পাশের বহু প্রাচীন গ্রাম ও কৃষি জমি ঘিরে বাড়তে শুরু করে বড় রাস্তা, রেল লাইন, বাইরে থেকে আগত মানুষের সংখ্যা ও ব্যাবসা বনিজ্য কেন্দ্র। এইরকম একটি জায়গায় 'খোলামুখ কয়লাখনি' (O.C.P.) স্থানীয় মানুষের কাছে আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপ হয়ে ওঠে। 'খোলামুখ কয়লাখনি'(O.C.P.) স্থানীয় পরিবেশের উপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরী করে তা স্বীকার করে পূর্বতন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু মহাশয়। ১৫/০২/১৯৮৯ তারিখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্বর্গীয় শ্রী রাজীব গান্ধী মহাশয়কে এক পত্রে (D.O. Letter No. 49-CM dt. 15/2/1989) বসতিপূর্ণ ও কৃষি জমি আছে এমন এলাকায় 'খোলামুখ কয়লাখনি' (O.C.P.) না খুলতে দেওয়ার ব্যাপারে অনুরোধ জানান। " ..... I fell that Goverment of India should either prohibit Opencast Mining in locations having built-in- areas, and aggricultural land, or in exceptional Cases when open Cast mining are to be operated in such areas, lay down strict guide lines. The guidelines should take care of not only prevention of environmental dammage in future operations but also for restoration of the damages done by open Cast mining in the past." এছাড়াও গত ২৮/০৭/১৯৮৯ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে এক সভায় MIC, Land & Land Reforms Deptt.; Member, Board of Revenue, Chairman, CIL; CMD, ECL মিলিতভাবে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহন করে - " It was impresed upon Coal India and ECL authorities that open cast mines should not be opened at or near areas with human habitations since its caused danger to the life and property of the local inhabitants and whenever open cast mining was undertaken, ECL should effectively discharge their statutory obligations to restore land to its original conditions. Fresh open cast mining can be started initially only in areas away from congested and populated areas and its extensions nearer such areas can be considered by the State Government, only after mining away from congested and populated areas has been exhausted" এমনকি গত ২০/০১/১৯৯০ এ রাণীগঞ্জ পৌরসভা হলে শ্রী বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী MIC, Land & Land Reforms, W. Bengal-এর সভাপতিত্বে এক সভায় Chairman, CIL, CMD, ECL রাজ্য সরকারের আধিকারিকরা এবং জনপ্রতিনিধিরা মিলিত ভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহন করে যে - "The sites of OCP's would be as far away as possible from human habitation" এতদ্সত্ত্বেও এখানে সেই 'খোলামুখ কয়লাখনি' (OCP) শুরু হয়েছে।

OCP -র অর্থ 'অগভীর খননকার্য' হওয়ার জন্য শুধু কৃষি জমি ও বনভূমি নষ্ট হওয়াই নয়, পানীয় জলের স্তর বহু নিচে নেমে যায় - যা এই এলাকায় এক তীব্র সঙ্কট তৈরী করেছে। শুধু তাই নয়, রাণীগঞ্জ এলাকায় পরিত্যক্ত কয়লাখনিগুলি থেকেই ভয়াবহ ধ্বসের বিপদ রয়েছে। পরিত্যক্ত খনি গুলির অভ্যন্তরীন ভারসাম্য বজায় আছে মূলত উদ্স্থৈতিক চাপ (Hydrostatic Pressure)-এর জন্য। ভূগর্ভস্থ জলের স্তরের কোনভাবে অবনমন ঘটলেই ধ্বসে ঢুকে যাচ্ছে বাস্তুজমি, কৃষি ও বনভূমি। এছাড়াও এই 'অগভীর খননকার্য' যে মানের কয়লা (F. Grade) উত্তোলন করছে - তাও তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মানের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিহীন। রাণীগঞ্জ এলাকায় উন্নত মানের কয়লা একমাত্র পাওয়া যেতে পারে আন্ডার গ্রাউন্ড পদ্ধতিতে 'গভীর খননকার্য চালিয়ে'। অতএব, আমরা দাবী করেছি যে, এলাকার মানুষের কাছে অভিশাপ এই OCP- বন্ধ করে আন্ডার গ্রাউন্ড প্রথায় খনন কার্য শুরু হোক।

২) কয়লাখনি সংক্রান্ত জমি অধিগ্রহন একমাত্র হতে পারে COAL BEARING AREAS (ACQUISATION & DEVELOPMENT) ACT (XX OF 1957) মোতাবেক। এই আইন অনুযায়ী একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই জমি অধিগ্রহন প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে 'সরিষাতলী খোলামুখ কয়লাখনি প্রকল্পে' রাজ্য সরকার, বর্ধমান জেলা কালেক্টর মারফৎ জমি অধিগ্রহন করেছেন Land Acquisation Act, 1894(Act I of 1894)-এর Section 4 অনুযায়ী। আগে এই নিয়ে বিতর্ক উপস্থিত হয়েছিল যে কয়লাখনি সংক্রান্ত জমি Land Acquisation Act, 1894 অনুযায়ী অধিগ্রহন করা যায় কি যায় না। উক্ত বিতর্ক সম্পূর্ণ সমাধান করা হয়েছে Coal Bearing Areas (Acquisation & Development) Act, 1957-এর Section 28 মারফৎ। Section 28 -এ বলা হয় যে Coal Bearing Areas (Acquisation & Development) Act, 1957 লাগু হবার দিন (8th June, 1957) থেকে কয়লাখনি সংক্রান্ত জমিতে Land Acquisation Act, 1894 মোতাবেক আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণত বাতিল করা হলো।

Coal Bearing Areas (Acquisation & Development) Act, 1957 অনুযায়ী জমি অধিগ্রহন কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না, যদি না Act, 1957-এর Section 13 অনুযায়ী জমিহারা মানুষদের জমির ক্ষতিপূরণ না দেওয়া হয়। Section 13-এ বলা হয়েছে জমির ক্ষতিপূরণ বর্তমান 'বাজার দর' অনুযায়ী হতে হবে। কিন্তু এই প্রকল্পের জমির ক্ষতিপূরণ 'বাজার দর' -এর অনেক কম দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে। সরিষাতলী কয়লাখনি প্রকল্পে ১৮৯৪ সালের ভূমি অধিগ্রহন আইন এবং পশ্চিমবঙ্গ ভূমি অধিগ্রহন নিয়মাবলী অনুযায়ী বর্ধমান জেলা আধিকারীক কর্তৃক জমির শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্য (১লা জুলাই, ১৯৯৮) নিম্নরূপ ঃ-

জমির শ্রেণীবিভাগ	নির্দ্ধারিত মূল্য (টাকা প্রতি একর)	সেলাসিয়াম (নির্ধারিত মূল্যের ৩০ %)	সুদ (নির্ধারিত মূল্যের ১২ %) প্রতি বছর)	সর্বমোট
বাইদ	২৫,৪৩০	৭,৬২৯	৩,০৫২	৩৬,১১১
পুকুর	২৫,৪৩০	৭,৬২৯	৩,০৫২	৩৬,১১১
বাগান	২৫,৪৩০	৭,৬২৯	৩,০৫২	৩৬,১১১
কানালি	৩৩,৯০০	১০,১৭০	৪,০৬৮	৪৮,১৩৮
বহাল	৩৮,১৫০	১১,৪৪৫	৪,৫৭৮	৫৪,১৭৩
ডাঙ্গা	১২,৭২০	৩,৮১৬	১,৫২৬	১৮,০৬২
ডোবা	১২,৭২০	৩,৮১৬	১,৫২৬	১৮,০৬২
ফায়ার ক্লে খনি	১২,৭২০	৩,৮১৬	১,৫২৬	১৮,০৬২
বাঁধ	১২,৭২০	৩,৮১৬	১,৫২৬	১৮,০৬২
গড়লায়েক পতিত	১০,১৭০	৩,০৫১	১,২২০	১৪,৪৪১
পাহাড়	১০,১৭০	৩,০৫১	১,২২০	১৪,৪৪১
নালা	১,০০০	৩০০	১২০	১,৪২০
পথ/রাস্তা	১,০০০	৩০০	১২০	১,৪২০
খাল	১,০০০	৩০০	১২০	১,৪২০
ইন্দারা	১,০০০	৩০০	১২০	১,৪২০
বাস্তু	৫০,৮৬০	১৫,২৫৮	৬,১০৩	৭২,২২১

রাজ্য সরকার সাম্প্রতিক কালে জমি কেনাবেচার ক্ষেত্রে জমির দাম কম দেখিয়ে সরকারী Revenue ফাঁকি দেওয়া বা চুরি করা রদ করতে প্রতিটি Registry Office মারফৎ প্রতিটি এলাকার 'জমির বাজার দর' নির্ধারণ করেছেন, এখন পশ্চিমবঙ্গে জমি কেনা বেচা করবার সময় যে দামেই জমি কেনা বেচা করিনা কেন - সরকার নির্ধারিত নির্দিষ্ট জমির Valuation মোতাবেক Revenue, Registry Office-এ দিতে হয়। Act, 1957-এর Section 13 অনুযায়ী এটাই 'বাজার দর'

Act, 1957 মোতাবেক কয়লাখনি অঞ্চলে জমি অধিগ্রহন সংক্রান্ত বিবাদ নিস্পত্তি করবার জন্য Tribunal গঠনের নির্দেশ আছে। এই প্রকল্পে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কোন Tribunal গঠিত হয়নি।

আমারা দাবী জানিয়েছি সমস্ত বেআইনি অধিগ্রহন বাতিল করতে এবং সমস্ত অধিগৃহীত জমি ফেরৎ দেবার।

Act, 1957-এর Section 13 অনুযায়ী জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ Registry Office-এর Valuation Rate দিতে হবে এবং Act, 1957 অনুযায়ী জমি অধিগ্রহন সংক্রান্ত বিবাদ নিস্পত্তি করতে Tribunal গঠন করা হোক।

৩) জমি অধিগ্রহন ও জমি হারাদের পুনর্বাসন সম্পর্কে Ministry of Energy, Department of Coal -এর Jt. Secretary Mr. O. P. Gulla 19/10/1990 Memo No. 9019/4/86-SP/LSW-তে জানান - "To the extent new employment opportunites get created in the project in unskilled and semi skilled categories, these shall be reserved entirely for land oustee families" তা সত্তেও বিভিন্ন জায়গায় জমিহারাদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরন আলাদা আলাদা। দুই একরের বেশি জমিহারা লোকেরা শুধু চাকরী পাবেন - এটা কারা, কিভাবে স্থির করলো? এই প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত ৬৫ জন জমিহারা লোক চাকরী পেয়েছেন। কিন্তু প্রকল্পে প্রায় ১২০০ জন চাকরী করেন। আমরা দাবী তুলেছি প্রতিটি অদক্ষ শ্রমিকের কাজে সমস্ত জমিহারা মানুষকে কাজ দিতে হবে। কয়লা পরিবহনের কাজে স্থানীয় ছেলেদের নিতে হবে।

এছাড়াও অন্যান্য স্থানীয় দাবী নিয়ে আমরা আন্দোলন করে চলেছি। তারফলে গত ১লা নভেম্বর, ২০০৪-এ বর্ধমান জেলা শাসক ও জেলা পুলিশ সুপার-ইন্-টেন্টেন্ড -এর উপস্থিতিতে সরিষাতলী কয়লা খনি প্রকল্প সম্পর্কে আসানসোল পৌরসভা হলে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অবশেষে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আন্দোলনের অনুকুলে আসে। যেমন, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের দাদাগিরি করে খাবার জায়গা PAP কমিটি বাতিল করে দেন এবং ব্লক স্তরে বিডিও কে আহ্বায়ক করে উন্নয়ণ কমিটি গঠন করেছেন। 'দিগুলী' ও 'রাখাকুড়া' গ্রাম দুটি অবিলম্বে পুণর্বাসনের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন।

প্রকল্পে নতুন নিয়োগ প্রাথমিক দরিদ্র জমিহারা লোকেদের থেকে নিতে হবে।

উক্ত সিদ্ধান্তের ফলে আন্দোলনে প্রাথমিক সাফল্য এসেছে। কিন্তু উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী করতে আমাদের আন্দোলন আরও তীব্র করা প্রয়োজন। যেমন গত ১২ই জানুয়ারী, ২০০৫ জামুড়িয়া থানার পুলিশ সহ আই. সি. এম. এল. কর্তৃপক্ষ পুর্ণবার রাখাকুড়া মৌজার অংশ জমি অধিগ্রহনের জন্য আসে। রাখাকুড়া গ্রামের মানুষের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ফলে তারা প্রতিহত হয় ও অধিগ্রহন বন্ধ হয়। পরবর্ত্তিতে ব্লক কমিটিতে পুণর্বাসন নিয়েই আলোচনা শুরু হয়েছে। কিছু কিছু পুরোন অসমাধিত কাজের সমাধান হচ্ছে।

সম্প্রতি সমগ্র কয়লাখনি অঞ্চল জুড়ে ধ্বস, গ্যাস ও আগুনে ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ ও পুণর্বাসনের দাবী, বেসরকারীকরণ, বন্ধ কলকারখানা খোলার দাবী, ইত্যাদি নিয়ে প্রাক্তন সাংসদ শ্রী হারাধন রায়ের নেতৃত্বে 'সারাভারত কয়লাখনি ও খনি অঞ্চল বাঁচাও সমিতি' গড়ে উঠেছে। আমরা মনে করি এটা এস. পা. পারও আন্দোলন। তাই আমাদের সর্বশেষ সভায় আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এস. পা. পা., 'সারাভারত কয়লাখনি ও খনি অঞ্চল বাঁচাও সমিতি'র সদস্যপদ গ্রহন করছে। সেই অনুযায়ী গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৫ শুক্রবার সমিতির কেন্দ্রীয় কর্মসূচী অনুযায়ী বারাবনী ও জামুড়িয়া ব্লকে আমরা সর্বোতভাবে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করেছি। ২০০৪ সালে সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্বায়ন বিরোধী 'বিশ্ব সামাজিক মঞ্চ' অনুষ্ঠিত হয় ভারতবর্ষে বম্বেতে। সেখানে 'সরিষাতলী কয়লাখনি প্রকল্প' সম্পর্কে ও আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা হয়। সেই আলোচনা শুনে ইংল্যান্ড থেকে 'মাইনস্ এ্যান্ড কমিউনিটিস্' সংগঠনের নেতা আমাদের প্রকল্প পরিদর্শনের জন্য আসেন। প্রকল্প দুর্গত গ্রামগুলি ঘুরে ঘুরে দেখেন। শেষে রাখাকুড়া গ্রামের সভায় তিনি এস. পা. পা.-র উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য হতে রাজী হন।

পরবর্ত্তিকালে ২০০৪-এর অক্টোবর মাসে New Initiative of Trade Union (NITU) ও Mines, Minerals and Peoples (mmp) এর যৌথ উদ্যোগে একটি তথ্য অনুসন্ধানের একটি দল আমাদের এখানে এসেছিলেন। তাঁরা তিন দিন ধরে এলাকা পরিদর্শন করেন। প্রকল্প দুর্গত গ্রাম ছাড়াও উক্ত প্রতিনিধি দল অতিরিক্ত জেলা শাসক, আসানসোল, আই. সি. এম. এল. ও এ্যাটওয়াল কর্তৃপক্ষের সাথেও আলোচনা করেন।

এই সমস্ত প্রক্রিয়াই আমাদের আন্দোলনকে প্রসারিত করতে ও শক্তিশালী করতে এবং দুর্গত মানুষের কাছে আমাদের সংগঠনকে বিশ্বাসজনক ও আস্থাভাজন হতে সাহায্য করেছে। এখন 'সারাভারত কয়লাখনি ও খনি অঞ্চল বাঁচাও সমিতি'-র শ্রী হারাধন রায়ের আন্দোলন আমাদেরকে আরও শক্তিশালি করবে এই আশা করি।

মূলত দুটি বিষয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করবার জন্য আমাদের আন্দোলনের শুভানুধ্যায়ী আইনজীবীর সাথে কথা হয়েছে। জমি অধিগ্রহনের প্রশ্নে, অধিগৃহীত জমির ন্যায্য মূল্যের প্রশ্নে এবং শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরীর দাবীতে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এই মামলা আমাদের আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করবে বলে বিশ্বাস রাখি।

এবারে আসি সাংগঠনিক প্রশ্নে। 'সরিষাতলী প্রজেক্ট্ এ্যাফেক্টেড পিপিল্স্ এ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হবার সময় যারা সামনে ছিলেন তাদের নিয়েই সাধারন পরিষদ (General Counsil) গঠিত হয়েছিলো। তারপরে ১২ জনকে নিয়ে একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছিলো। সাধারন পরিষদ কখনই বসেনি। কয়েকটি গ্রাম ছাড়াও অন্য গ্রামগুলোর আগ্রহ খুব বেশি নয়। অনেক চূড়ান্ত সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এস. পা. পাকেও PAP কমিটির বিপরীতে দাঁড় করিয়ে সুবিধা পেতে চেয়েছেন। পরবর্ত্তিতে কুড়িটা গ্রামে গ্রাম কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। গ্রামগুলি হলো - ১) বারাবনী ২) জয়রামডাঙ্গা ৩) পুঁচড়া ৪) ভানোড়া ৫) দোমাহানী ৬) চরণপুর ৭) নতুনডিহি ৮) খোড়াবড় ৯) জামগ্রাম ১০) হসুনপুর ১১) পুটুলিয়া ১২) রসুনপুর ১৩) কাপিষ্টা ১৪) রাখাকুড়া ১৫) দ্বিগুলী ১৬) আনন্দপুর ১৭) চুরুলিয়া ১৮) মদনপুর ১৯) কেলেজোড়া ২০) বারাবনী গেট।

সিদ্ধান্ত হয়েছিলো প্রতিটি গ্রাম কমিটির সম্পাদক ও সহসম্পাদককে সাধারণ পরিষদে নিয়ে আসা হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অনেক গ্রামে গ্রাম কমিটি গঠিত হয়নি। গ্রাম রেজিষ্টার ও জমিহারা লোকেদের তালিকা সম্পূর্ণ হয়নি। এই কাজটি এবারের সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে করতে হবে।

৯২ জন কার্যকরী কমিটির সদস্যের মধ্যে অনেকে বেশিরভাগ সভায় উপস্থিত হয়নি। কার্যকরী কমিটি সর্বমোট ২০টা সভা করেছে। প্রতিটি সভায় উপস্থিত ছিলেন একমাত্র সম্পাদক। সভাপতি ১৭টি সভায়, সহসম্পাদক স্বরাজ দাস ১৫টি সভায় উপস্থিত ছিলেন। বাকীরা সবাই ১০-এর নীচে। সহ-সভাপতি সেখ মোক্তার হোসেন একটি সভাতেও উপস্থিত হননি।

আন্দোলনের স্বার্থে আমাদের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সেটা না করার জন্য আমারা অনেক প্রশ্নই তুলতে পারিনি বা তুললেও ভূলভাবে তুলেছি। আমাদের একটি তথ্য সংগ্রহের দল তৈরী করা উচিৎ। এব্যাপারে আসানসোলের 'উদ্যোগ' পত্রিকার বন্ধুদের সাথে আমরা যোগাযোগ করেছি। তাদের কয়েকজন এই তথ্য সংগ্রহের কাজে রাজী হয়েছেন। আমাদের তথ্য সংগ্রহের কাজটা উদ্যোগ নিয়ে শুরু করতে হবে।

এই সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে সাধারণ পরিষদ (General Counsil) ও কার্যকরী কমিটি (Executive Committee) এমন ভাবে গঠিত হওয়া উচিৎ যেন তা কাজ করে।

আশাকরি এই সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিরা সবাই সম্পাদকীয় প্রতিবেদন নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করবেন। সম্মেলনে আগত সমস্ত অতিথিদের সম্মেলনের পক্ষ থেকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই এবং একই সাথে অনুরোধ জানাচ্ছি 'সরিষাতলী প্রজেক্ট এ্যাফেক্টেড পিপিল্‌স্ এ্যাসোসিয়েশন'-এর উপদেষ্টা মন্ডলীতে থাকবার। আশাকরি আপনারা আমাদের আবেদনে রাজী হবেন।

এস. পা. পা. জিন্দাবাদ

প্রকল্প দুর্গত মানুষের আন্দোলন জিন্দাবাদ

১১ই মার্চ, ২০০৫, শুক্রবার